বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব প্রাচীন ভারতবর্ষে। খ্রিষ্টের জন্মের ছয়শত বছর পূর্বে। প্রায় আড়াই হাজারেরও অধিক বছর আগে। এ সময় বেশিরভাগ মানুষই ছিল অন্ধ বিশ্বাস আর ভ্রান্ত ধারণায়। যাগ–যজ্ঞ ও পশুবলি ছিল ধর্মীয় সংস্কার। কল্পিত অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টির জন্য এগুলো করা হতো। সকল প্রকার সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এগুলোই ছিল ধর্মাচার। বুদ্ধ সেই অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টির চেয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথা বললেন। সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে বলেন। এর জন্য তিনি আত্নশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে বলেন। বিবেচনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে বললেন। যার মাধ্যমে মানুষের বিবেক জাগ্রত হবে, বিচার বিবেচনার ধারা হবে যুক্তিশীল। তাঁর এ কথায় সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সকলেই আকৃষ্ট হলেন। অনুপ্রাণিত হলেন নব চেতনায় । এ অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মের সেই ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -১৪.১ : প্রাক-বৌদ্ধযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা পাঠ -১৪.২ : গৌতম বুদ্ধের সময়কাল পাঠ -১৪.৩ : মৌর্য যুগ পাঠ -১৪.৪ : কুষাণ যুগ পাঠ -১৪.৫ : পাল যুগ পাঠ -১৪.৬ : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম	বুদ্ধকালীন সময়ে মানুষ ছিল অন্ধ বিশ্বাস আর ভ্রান্ত ধারণায় পর্যবসিত। যাগ–যজ্ঞ ও পশুবলি ছিল ধর্মীয় সংস্কার। কল্পিত অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টির জন্য এগুলো করা হতো। নানা সংকট ও সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এগুলোই ছিল ধর্মাচার। বুদ্ধ সেই অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টির চেয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথা বললেন এবং আত্নশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে বলেন। বুদ্ধি-বিবেক বিবেচনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে বললেন। অন্তর্দৃষ্টিতে যুক্তিশীল হতে বললেন।

পাঠ-১৪.১ প্রাক-বৌদ্ধযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাক বুদ্ধ যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুদ্ধ পূর্ব যুগে মানুষের ধর্ম বিশ্বাস কী ধরণের ছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	চারিবর্ণ, ব্রহ্মা, বৈদিকধর্ম, নির্গ্রন্থ পন্থী, যাগযজ্ঞ, নানা কুসংস্কার।

বুদ্ধের আবির্ভাব প্রাচীন ভারতবর্ষে । ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা মনীষীর জন্ম হয়েছে। সামাজিক রীতি নীতিও প্রবাহিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। প্রাক বুদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। বুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল। তখন ভারতবর্ষ ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত । রাজারা জনগণের কাছ থেকে ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি কর হিসেবে গ্রহণ করতো। সমাজে ছিল রাজা, পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধারণ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ। তাদের সকলকে চারি বর্ণে ভাগ করা হতো। সেই প্রচলিত চারিবর্ণ বিভাজনের ধারায় তাদের বলা হতো– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ করে ব্রহ্মা ও অন্য দেবতাদের উপাসনা করত। ব্রহ্মার প্রসাদে স্বর্গসুখ লাভ হয় এরূপ বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। ব্রহ্মাকে গণ্য করা হতো পৃথিবী এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তারূপে। তাই মানুষের সর্ববিধ ধর্ম কর্ম ও চিন্তা ছিল ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করেই ।

ব্রহ্মার অস্থিত্ব অদৃশ্য হলেও ব্রাহ্মণদের মূল্যায়ন করা হতো তাঁর প্রতিভূ হিসেবে। ব্রাহ্মণেরা তখন প্রচার করত যে, ব্রহ্মা নিজ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যে অঙ্গ থেকে যার সৃষ্টি, সে ভাবে সামাজিক অবস্থানও তার নির্ধারিত। ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয় ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর পায়ের ময়লা থেকে শুদ্র। ব্রাহ্মণেরা এজন্য দেবতার প্রতিনিধি। পূজা অর্চনা ও উপদেশনা ব্রাহ্মণের কাজ। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা, বৈশ্যরা বণিক এবং শুদ্ররা ছিল ভৃত্য শ্রেণির।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যাগযজ্ঞ ছাড়াও নানা রকম মন্ত্র, ঝাড় ফুঁক প্রভৃতির প্রচলন ছিল। যদিও শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজের সকলকে এই ধর্ম তৃপ্তি দিতে পারতো না। এজন্য সত্য অনুসন্ধানে তারা নানা পথ অবলম্বন করতো। এ বিষয়ে ক্ষত্রিয়রা ছিল অগ্রগণ্য। তারা গতানুগতিক ধর্মপথে সুখ লাভ করতো না। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে তাদের ইচ্ছাকেই তারা বেশি প্রাধান্য দিতেন।

প্রাক্ বুদ্ধ যুগের ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পশুরক্তে দেশ প্লাবিত হতো। কারণ বিশ্বাস করা হতো যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হবে ধন ও সুস্বাস্থ্য লাভ। আবার পরলোকেও মিলবে স্বর্গসুখ। কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা মানুষের চিরস্থায়ী কল্যাণ আসেনা, সে কথা কেউ বুঝতো না। যজ্ঞ করেও যখন কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হচ্ছেনা, তখন ক্রমে ক্রমে মানুষের চিন্তা পরিবর্তন হতে লাগলো। এসবের বিরুদ্ধে তখন মানুষের মনে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে সমাজে বিশৃংখলা যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনি মুক্তি সন্ধানী মানুষেরও আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ ক্রমে যুক্তি নির্ভর হতে শেখে।

সে সময় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অনুশীলন ও বিশ্বাসেও ছিল ভিন্নতা। বৈদিক ধর্মের প্রভাব ছিল অগ্রগণ্য। প্রাক্ বুদ্ধ যুগের বৈদিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদও প্রচলিত ছিল। এগুলো প্রচার করতেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নির্গ্রন্থ পন্থী ধর্ম অনুসারিরা। নির্গ্রন্থ বলতে গ্রন্থহীনকে বোঝায়। অর্থাৎ যাঁরা গ্রন্থ পড়ে ধর্মচর্চার প্রয়োজন মনে করেন না তাদের নির্গ্রন্থ বলা হয়। তাঁরা নিজেরাই সর্বজ্ঞ বলে মনে করেন। বুদ্ধের প্রায় আড়াইশ' বছর আগে কাশীর পার্শ্বনাথ এরূপ ধর্ম প্রচার করেন। এরপরে আসে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। তিনি গৌতম বুদ্ধের প্রায় ২৪ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মুনি ঋষিরা থাকতেন তপোবনে। তাঁরা প্রয়োজনে জন সমাজে আসতেন। তাঁরা বেদ অধ্যয়ন ও ছাত্রদের শিক্ষাদান করে জীবন নির্বাহ করতেন। লোক সমাজে ব্রাহ্মণদের চেয়ে এঁদের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি ছিল। তাই নানামুখি অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা ও দ্বন্দ্ব নিয়েই চলছিল সমাজ। এই অবস্থা ও পটভূমিতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ শাক্যরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধার্থ গৌতম । তিনি অফুরন্ত ত্যাগ তিতিক্ষা ও দীর্ঘকাল ধ্যান সমাধি পর পরম সম্বোধিজ্ঞান লাভ করে জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন।

সারসংক্ষেপ :

প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল বিশাল দেশ। এই ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা মনীষীর জন্ম হয়েছে। সামাজিক রীতি নীতিও প্রবাহিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এখানে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব। এ সময় বেশিরভাগ মানুষই ছিল অন্ধ বিশ্বাস আর ভ্রান্ত ধারণায়। যাগ–যজ্ঞ ও পশুবলি ছিল ধর্মীয় সংস্কার। কল্পিত অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টির জন্য এগুলো করা হতো। বুদ্ধ যুগের আগে ভারতবর্ষ এরকম বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। এ সময় বৈদিক ধর্মের প্রভাব ছিল অগ্রগন্য। এছাড়া নির্গ্রন্থ ও জৈন ধর্মের প্রভাবও প্রচলিত ছিল। তখন মুনি ঋষিরা থাকতেন তপোবনে। তারা প্রয়োজনে জন সমাজে আসতেন। তাঁরা বেদ অধ্যয়ন ও ছাত্রদের শিক্ষাদান করে জীবন নির্বাহ করতেন। লোক সমাজে ব্রাহ্মণদের চেয়ে এঁদের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি ছিল। মানুষ বিচার বুদ্ধিহীন হয়ে মুনি ঋষিদের কথার ওপর বিশ্বাসী ছিল। তাই নানামুখি অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা ও দ্বন্ধ নিয়েই চলছিল প্রাক্ বুদ্ধ যুগের ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ কয়টি বর্ণে বিভক্ত ছিল ?

ক. দুই বর্ণে খ. ত্রি- বর্ণে

গ. চারি বর্ণে ঘ. পঞ্চ বর্ণে

২। 'ব্রহ্মার শরীরের থেকে মানুষের সৃষ্টি' কারা প্রচার করতেন ?

ক. ব্রাহ্মণেরা খ. রাজারা

গ. সাহিত্যিকেরা ঘ. পুরোহিতেরা

৩। নির্গ্রন্থ বলতে কী বোঝায় ?

ক. গ্রন্থ কীটকে বোঝায় খ. গ্রন্থ ধূরকে বোঝায়

গ. জ্ঞানীদেরবোঝায় ঘ. গ্রন্থহীনকে বোঝায়

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ক, ৩. ঘ

পাঠ-১৪.২ গৌতম বুদ্ধের সময়কাল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- গৌতম বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতবর্ষের ষোড়শ মহাজনপদ-এর পরিচয় বলতে পারবেন ।
- বুদ্ধের সমকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজাদের সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	৬২ প্রকার মতবাদ, ব্রহ্মজাল, ছয়টি প্রসিদ্ধ শ্রমণ সঙ্ঘ, পাপসংবরণবাদী, নিয়তিবাদ, উচ্ছেদবাদী, অগ্নি উপসাক, মহাজনপদ।

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্ট পূর্ব ৬২৩ অব্দে। এসময় ভারতবর্ষে ৬২টি প্রকার মতবাদ প্রচলিত ছিল। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্রপিটকের দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এ তথ্য বর্ণিত আছে। এ মতবাদসমূহকে কেন্দ্র করে ছোট বড় নানা সন্ন্যাস সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। এছাড়া পৃথক মতবাদের অনুসারি ছয়টি প্রসিদ্ধ শ্রমণসঙ্ঘ ছিল। তাঁরা হলেন পূরণ কশ্যপ,মক্খলি গোসাল, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্র, সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্র ও অজিত কেশকম্বলি। তাঁদের প্রত্যেকের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল। শিষ্যদের কাছে এ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মতবাদ প্রচার করতেন। এ মতবাদসমূহ ছিল খণ্ডিত। সাধনার পূর্ণতা অর্জন বা সর্ববিধ দুঃখ মুক্তির কোনো নির্দেশনা এতে ছিল না। যেমন পূরণ কশ্যপের মতবাদ ছিল অক্রিয়বাদ। ভাল বা মন্দ কোনো কাজের কোনো ফল নাই। মানুষের কর্ম হলো ইচ্ছার প্রতিফলন মাত্র। এর সাথে জীবন, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কোনো সম্পর্ক নাই।

মক্খলি গোসালের মতবাদ হলো নিয়তিবাদ। তার মতে প্রাণিগণ কোনো হেতু বা কারণ ছাড়া পবিত্র বা অপবিত্র হয়। নিজের বা পরের শক্তিতে কিছু হয়না। নিয়তি বা অদৃষ্ট এবং স্বভাবের বশে প্রাণিগণ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।
পকুধ কচ্চায়নের মতবাদকে অন্যোন্যবাদ বলা হয়। তার মতে মাটি, পানি, আলো, বাতাস, সুখ, দুঃখ ও আত্মা এই সাতটির কোনো পরিবর্তন নাই। এগুলো আপন শক্তিতে শক্তিমান। অন্য কোনো কিছুর দ্বারা এই সাতটি উৎপন্ন বা বিনাশ হয়না। এগুলোর বাইরে অন্য কোনো শক্তি জগতে ক্রিয়াশীল নয়।

নিগণ্ঠ নাথপুত্র ছিলেন সংবরণবাদী। তার মতে তিনি সর্ববিধ পাপ সংবরণ করেছেন, পাপ ইচ্ছাবৃত্তিসমূহকে সংবরণ করেছেন, সর্ববিধ জলের ব্যবহার সংবরণ করেছেন সুতরাং তার চিত্ত সংযত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তার দৃষ্টিতে সকলের এগুলো অনুশীলন করা উচিত।

সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্রের মতবাদ ছিল বিক্ষেপবাদ। এরূপ মতবাদকে সংশয়বাদও বলা হয়। তার মতে সত্য ও ধ্রুব বলে কোনো সিদ্ধান্ত বা কথা নাই। সব বিষয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মহা অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন প্রথমে সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্রের অনুসারি ছিলেন। বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিত স্থবিরকে দেখে তাঁরা বুদ্ধের ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হন এবং পরবর্তিতে বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অজিত কেশকম্বলি ছিলেন উচ্ছেদবাদী। তাঁর মতে শরীর নিঃশেষের সাথে সাথে জীবের সব কিছুই বিনাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর কিছুই নাই। তিনি বলেন চারটি উপাদানে জীবের উদ্ভব। তাহলো মাটি, পানি, আলো ও বাতাস। মৃত্যুতে এই চারভূতেই জীব বিলীন হয়ে যায়। ইহকাল–পরকাল, পাপ –পুণ্য, কর্মের ভাল – মন্দ ফল বলতে কিছুই নাই।

বুদ্ধের সময়কালে বিভিন্ন মতাদর্শ যেমন ছিল তেমন বিভিন্ন রকম বিদ্যাশিক্ষারও প্রচলন ছিল। যেমন ধনুর্বিদ্যা, অশ্বচালনা বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, যুদ্ধ বিদ্যা ইত্যাদি। আত্মশক্তির উদ্বোধন পূর্বক মনুষ্যত্ব বোধকে বিকশিত করার ধারা সমাজে গড়ে ওঠেনি। জীবসত্ত্বার দুঃখ মুক্তির বিষয়টি তখনো রহস্যাবৃত ছিল। জগতের সামনে সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য কোনো মুক্তি পথের নির্দেশনাও ছিলনা। তাই মানুষ অশরীরি, অদৃশ্য শক্তি কল্পিত দেবতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। এ কারণেই সমাজে যাগ যজ্ঞ ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাব বেশি ছিল। দীর্ঘদিনের এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে বুদ্ধের সময়কালে। বুদ্ধ বললেন, নিজের কর্মের মাধ্যমেই নিজের ভবিষ্যত রচিত হয়। কারো আশির্বাদ বা যাগ যজ্ঞের প্রভাবে নয়। যে যেমন কর্ম করবে, সে তেমন ফল ভোগ করবে। যতই ক্ষমতাধর হোক বা নিকৃষ্ট কোনো ব্যক্তিই হোক কর্মের ফল থেকে কেউ রেহাই পায় না। যেরূপ বীজ বপন করা হয় সেরূপ ফল পাওয়ার মতোই একটি প্রক্রিয়া। বুদ্ধের এ বাণী মানবগোষ্ঠীর চিন্তায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো। মানুষ সততা, নৈতিকতা ও আদর্শবাদি আচরণের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার পথ খুঁজে পেলে। ক্রমে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সন্ন্যাস মতবাদ ছাড়াও খ্যাতিসম্পন্ন কিছু ধর্ম সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠেছিল। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলো জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। মহাবীরের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল রাজগৃহ। কিন্তু তাঁর সাথে বুদ্ধের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। চার্বাকের লোকায়ত দর্শন তখন প্রচলিত ছিল। তারা ছিল বস্তুবাদী ও ভোগবাদী। এছাড়া অগ্নি উপাসক, জল উপাসক ছাড়াও নানা অদ্ভূত ক্রিয়াকাণ্ড অনুশীলন করা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষকে তখন বলা হতো জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের শাসন ব্যবস্থা ছিল গ্রিকদের মত নগরকেন্দ্রিক শাসন। তবে রাজাদের মধ্যে রাজ্য বিস্তারের প্রবণতা ছিল। সে কারণে যুদ্ধ বিগ্রহও ছিল।

তৎকালীন ভারতবর্ষে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল উত্তরে কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী ও বুদ্ধগয়া হয়ে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত। পশ্চিমে সাঙ্কাশ্য থেকে পূর্বে অঙ্গ, বৈশালী ও তদ্‌সংলগ্ন অঞ্চল। গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ১৬টি জনপদ বা রাজ্য ছিল। এ রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিকে 'মহাজনপদ' বলা হতো। ইতিহাসে এগুলো 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে খ্যাত।

ষোলটি জনপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গৌতম বুদ্ধের সময়কালের ষোলটি রাজ্যের সবগুলোই খুব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল না। এতে অনেক রাজ্য অন্য রাজ্যের আগ্রাসনের কারণে নিজস্ব স্বকীয়তাও হারিয়ে ছিল। তারপরও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি রাজ্য হলো নিম্নরূপ:-

১। অঙ্গ ; ২। মগধ ; ৩। কাসী ; ৪। কোসল ; ৫। বজ্জী ; ৬। মল্ল; ৭। চেতী; ৮। বংস ; ৯। কুরু; ১০। পঞ্চাল ; ১১। মৎস্য ; ১২। সূরসেন ; ১৩। অশ্মক ; ১৪। অবন্তী ; ১৫। গান্ধার ; ১৬। কম্বোজ।

নিচে এই ষোলটি জনপদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো।

১. অঙ্গ

অঙ্গ রাজ্যটি ছিল মগধের পূর্বদিকে। মগধ রাজ্য ও অঙ্গ রাজ্যের সীমানা বিভক্ত হয়েছিল চম্পানদীর মাধ্যমে। চম্পানদী এ দুই রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছিল। এ নদী ছিল মগধের অন্তর্গত। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা নগরী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রি মহাগোবিন্দ এ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। চম্পানদী ও গঙ্গানদীর সংগম স্থলস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে চম্পা নগরী অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময় ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা অঙ্গে রাজত্ব করতেন। রানি গগ্‌গরা অত্যন্ত বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি চম্পা নগরীতে একটি বিশাল দিঘী খনন করিয়েছিলেন। এই দিঘীর পাড়ে একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সূত্র পিটক অনুসারে গৌতমবুদ্ধ এখানে আটবার ধর্ম দেশনা করেছিলেন। মগধের যুবরাজ বিম্বিসার রাজা

ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অঙ্গ অধিকার করেন। সে সময় এ রাজ্য মগধের সাথে একত্রিত হয়ে অঙ্গ–মগধ নামে পরিচিতি লাভ করে।

২. মগধ

বর্তমান ভারতের পাটনা ও গয়া জেলার স্থলেই ছিল মগধ রাজ্য। এর উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে শোন নদী, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখা এবং পূর্বে ছিল চম্পা নদী। গয়ার নিকটস্থ প্রাচীন রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। রাজগৃহে গৌতমবুদ্ধ চাব্বিশ বারেরও বেশি ধর্ম দেশনা করেন বলে জানা যায়। এখানে বুদ্ধ অনেকবার বর্ষাবাসব্রত যাপন করেন। বুদ্ধের সময় মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহের বেলুবন উদ্যানটি তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্গের জন্য দান করেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের কল্যাণে আরও অনেক মহৎ কাজ করেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন সূত্রে রাজা বিম্বিসারের নাম উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় যুবরাজ অজাতশত্রু অন্যের প্ররোচনায় পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি প্রথম জীবনে বুদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন, এবং অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। তিনিও বুদ্ধের গৃহী শিষ্য ছিলেন। অজাতশত্রু মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তর করেছিলেন। তদানীন্তকালে জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসেবে পাটলিপুত্রের খ্যাতি ছিল।

৩. কাসী

প্রাচীন ভারতে কাসী এক উন্নতশীল ও সম্পদশালী রাজ্য ছিল। শিক্ষা ও শিল্পকলার উন্নতিতে কাসী রাজ্যের খুব খ্যাতি ছিল। কাসীর রাজধানী ছিল বারাণসী। এটি ছিল সে সময়ের এক প্রসিদ্ধ নগরী। বারাণসীস্থ সারনাথের ঋষিপতনের মৃগধাবে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। রারাণসীর বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধ দশবার ধর্ম দেশনা করেন। বুদ্ধের প্রথম বর্ষাব্রত এখানেই পালন করেন। এ রাজ্যের অনেক রাজাকেই ব্রহ্মদত্ত নামে নির্দেশ করা হতো। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে এ রাজ্য কোসলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাসী– কোসল নামে খ্যাত হয়।

৪। কোসল

কোসল ছিল একটি নদী বেষ্টিত রাজ্য। এর পশ্চিমে সুমতি নদী, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যান্দিকা নদী, পূর্বে সদানীরা নদী ও উত্তরে ছিল নেপালের পার্বত্য অঞ্চল। কোসলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। পালি ভাষার উচ্চারণে এটি 'সাবত্থী'। সবত্থ নামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁর বাসস্থান বলে এটিকে 'সাবত্থী' বলা হয়। আবার অনেকের মতে এ শহরে সবকিছু পাওয়া যায় বলে এটির নাম শ্রাবস্তী বা সাবত্থী হয়। শ্রাবস্তী অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অচিরাবতীর বর্তমান নাম রাপ্তী নদী। বুদ্ধের সমকালে রাজা প্রসেনজিৎ এখানে রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। বুদ্ধের অনুসারী দু'জন প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী কোসল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। অনাথপিণ্ডিক জেতবন বিহার এবং মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ নয়শ'দশ বারের অধিক ধর্ম দেশনা করেন। বুদ্ধ প্রায় পঁচিশ বর্ষাবাসব্রত শ্রাবস্তীতে পালন করেন। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী অযোধ্যা ও সাকেত কোসলের অন্তর্গত ছিল।

৫. বজ্জী

গঙ্গার উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ রাজ্য। এর পশ্চিমে ছিল গণ্ডক নদী এবং পূর্ব দিকে ছিল কোশী ও মহানন্দা নদী। রাজধানী ছিল বৈশালী। বুদ্ধের সময় বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী। বজ্জীরা অত্যন্ত সুশৃংখল জাতি ছিল। তারা সংঘবদ্ধভাবে সকল কাজ সমাধা করতেন। বুদ্ধ বজ্জীদের এ রূপ আচরণের প্রশংসা করেছেন।

বজ্জী রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে এক সময় মহামারি , দুর্ভিক্ষ ও ভূত প্রেতের ভয়ে সকলে দিশাহারা হয়ে পড়ে। স্বয়ং রাজা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছিলেন না। তখন নিরূপায় হয়ে সকলে সর্বসত্ত্বার হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ বজ্জী রাজ্যবাসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বজ্জীরাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল চিত্তে উপযুক্ত মর্যাদায় বুদ্ধকে স্বরাজ্যে আনায়নের ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধের আগমনে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এতে জল প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এতে পঁচা শবাদিসহ নোংরা গন্ধ আবর্জনাদি বিনাশ হয়। এ সময় তথাগত বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে বৈশালীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে 'রতন সূত্র' পাঠের আদেশ দেন। সূত্র পাঠের পর উক্ত ত্রিবিধ ভয় উপশম হয়। বুদ্ধের এ আগমন উপলক্ষে বৈশালীর বিভিন্ন জায়গায় চৈত্য নির্মাণ করা হয়। পরে বুদ্ধ বজ্জীবাসীর উদ্দেশ্যে 'সপ্ত অপরিহানিয়' নামে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিজনক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁর শেষ বর্ষাবাসব্রত বৈশালীতে পালন করেছিলেন।

৬. মল্ল

মল্ল রাজ্য ছিল বজ্জী রাজ্যের পূর্বে ও কোসল রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। মল্ল রাজ্যের ওপর দিয়ে বুদ্ধ বহুবার যাতায়াত করেছেন। মগধ ও কোসলে যাওয়ার রাস্তা মল্ল রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছিল। মল্লদের রাজধানী ছিল কুশীনারা। এটিকে কুশীনগরও বলে। এর অবস্থান ছিল হিরণ্যবতী নদীর তীরে। এ নদীর বর্তমান নাম শোন নদী। কুশীনারাস্থ মল্লদের শালবনে তথাগত গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর এখানে শ্মশানে তাঁর যে দেহাবশেষ ছিল তা দ্রোণ ব্রাহ্মণের মাধ্যমে আটজন ভাগ করে নিয়ে সেগুলোর ওপর চৈত্য নির্মাণ করেন। পরবর্তিতে সম্রাট অশোক এখানে বুদ্ধের বিশাল পরিনির্বাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৭. চেতী

চেতী চেদী রাজ্যের অবস্থান ছিল যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল কুরু রাজ্যের পাশে। চেতীর রাজধানী ছিল সোত্থিবতী বা স্বস্তিবতী বা শুক্তিমতি। এটি বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। বেস্সন্তর জাতকে বর্ণিত 'শিবি' রাজ্য এই চেতী রাজ্যে সংলগ্ন ছিল। বুদ্ধের সময় শিবি ও চেতী এ দুই রাজ্যের নাম লোকমুখে নানাভাবে উচ্চারিত হতো । বুদ্ধ চেতীতে একবার ধর্ম দেশনা করেন।

৮. বংস

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বংস রাজ্য অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী বা আধুনিক কোসম ছিল এর রাজধানী। এখানে উদয়ন নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। তিনি হাতি ধরার মন্ত্র জানতেন। তিনি পিণ্ডল ভারদ্বাজ নামের এক ভিক্ষুর মাধ্যমে বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন। রাজা উদয়নের প্রধান রাণি শ্যামাবতী ও তার প্রধান সেবিকা খুজ্জওরা দু'জনই বুদ্ধের অনুসারি ছিলেন। কৌশাম্বীর এক উদ্যানে রানি শ্যামাবতী একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। এ বিহারের নাম ঘোষিতারাম। এখানে রাজা উদয়ন বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই রক্তচন্দন কাঠ দ্বারা একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৯. কুরু

কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। এটি বর্তমান দিল্লির কাছে ইন্দ্রপত অঞ্চল। বুদ্ধের সময় পৌরব্য নামের এক রাজা রাজত্ব করতেন। বুদ্ধ কুরু জনপদ অনেকবার পরিভ্রমণ করেন। এখানে বুদ্ধ চারবার ধর্ম দেশনা করেন। কুরুর বিশিষ্ট ধনী যুবক রাষ্ট্রপাল বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

১০. পঞ্চাল

রোহিলখণ্ড এবং মধ্য দোয়ারের একাংশ নিয়ে পাঞ্চাল গঠিত। গঙ্গা নদী এ রাজ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিল। একটি ছিল উত্তর পাঞ্চাল, অন্যটি দক্ষিণ পাঞ্চাল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র বা ছত্রবতী। এটি বর্তমানে রামনগর নামে পরিচিত। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য।বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের খুব বেশি প্রভাব ছিল বলে অনুমিত হয়না। এ রাজ্যের জনসাধারণ ও নগর সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

১১. মৎস্য

চেতী রাজ্যের পার্শ্বস্থ চম্বলের পার্বত্য অঞ্চল ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী বনাঞ্চল নিয়ে মৎস্য রাজ্য বা জনপদ গঠিত। এর মধ্যস্থলে ছিল রাজধানীর মর্যাদা সম্পন্ন 'বিরাট নগর'। এটি হলো বর্তমান জয়পুরের বৈরাট। বুদ্ধ এ রাজ্য কয়েকবার ভ্রমণ কছিলেন বলে জানা যায়। বৈরাট নগরে সম্রাট অশোকের কয়েকটি বিখ্যাত শিলালিপি পাওয়া গেছে।

১২. সূরসেন

এটি যমুনার তীরবর্তী একটি রাজ্য। এর রাজধানী ছিল মথুরা। বুদ্ধের সময় এখানে রাজত্ব করতেন যদুবংশীয় রাজা অবন্তিপুত্র। তিনি মহাকচ্চায়নের সমসাময়িক এবং বুদ্ধের অন্যতম গৃহী শিষ্য ছিলেন। এ রাজার পৃষ্টপোষকতায় মথুরা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

১৩. অশ্মক

অশ্মক বা অস্সক রাজ্য ছিল গোদাবরী নদীর কূলবর্তী অঞ্চলে। রাজধানী ছিল পোটলি, পোটন বা পোদন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন অস্সক। তার সম্পর্কে তেমন বেশি জানা যায় না।এখানে বাবরি নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

১৪. অবন্তী

নর্মদা উপত্যকার মান্ধাতা থেকে মহেশ্বর ও পাশ্ববর্তী কয়েকটি জেলা নিয়েই গঠিত হয়েছিল অবন্তী রাজ্য। রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। বুদ্ধের সময়ে এখানে রাজা ছিলেন চণ্ডপ্রদ্যোত। বুদ্ধ অবন্তী রাজ্যে এসেছিলেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অবন্তী রাজার পুরোহিত পুত্র মহাকাত্যায়ন বুদ্ধের একজন খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন।

১৫. গান্ধার

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র হিসেবে গান্ধার রাজ্যের সুখ্যাতি ছিল। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। বুদ্ধের সময় এখানে পুক্কুস্‌সাতি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি শেষ বয়সে রাজ্য ছেড়ে পায়ে হেঁটে রাজগৃহে গিয়ে বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা ছিল তদানীন্তন কালের বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক এখানেই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশিলা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

১৬. কম্বোজ

বর্তমান কালের ভারত এবং পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে গান্ধারের নিকটবর্তী কম্বোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। কম্বোজের রাজধানী হিসেবে দু'টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো দ্বারকা ও রাজপুর। কম্বোজে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এ রাজ্যে চন্দ্রবর্মন ও সুদক্ষিণ নামের দু'জন রাজার কথা জানা যায়। বুদ্ধের সময় কোন রাজা ছিলেন এর সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এ রাজ্যে কুক্কুটবতী নামের এক নগরী ছিল। সে নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন মহাকপ্পিন। তাকেও রাজা নামে আখ্যায়িত করা হতো। রাজা মহাকপ্পিন বুদ্ধ বাণীর গুণ মহিমা উপলব্ধি করে সপরিষদ মধ্যদেশের চন্দ্রভাগা নদী তীরে বুদ্ধের কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন রাজাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবদান

বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে যাঁরা বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে নানাবিধ অবদান রেখে খ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের অগ্রজ ও অগ্রগণ্য হলেন রাজা বিম্বিসার। তিনি মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বেও একবার সাক্ষাত হয়। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম সন্ন্যাস ব্রত পালনের মাধ্যমে জীবনের অনিবার্য দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণায় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন। রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থ গৌতমের সুন্দর সুগঠিত দেহাবয়ব দেখে তাঁকে সেনাপতির পদ দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। উত্তরে সিদ্ধার্থ গৌতম বলেছিলেন তিনি কোসল রাজ্যের অন্তর্গত শাক্যগণের সমৃদ্ধশালী রাজ্য কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র, তিনি সকল ভোগ বিলাস ত্যাগ করেছেন। দুঃখমুক্তির পরম জ্ঞান লাভের ব্রত নিয়েই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তখন রাজা বিম্বিসার বলেছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ তিনি তাঁর শরনাগত হবেন। সত্যিই বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শরণাগত হন। তিনি বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের জন্য রাজ্যে আদেশ জারি করেছিলেন। এ সময় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ অসাধু কর্মে যুক্ত ব্যক্তিরা এ সুবিধা লাভ করে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বিম্বিসার বিষয়টি বুদ্ধের কাছে জানালেন। এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধ রাজভৃত্য, চোর–ডাকাত, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী, ও ঋণী ব্যক্তিদের প্রব্রজ্যা না দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া বুদ্ধের গৃহী শিষ্যদের জন্য বিনয় নীতি প্রবর্তনের জন্য রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে বুদ্ধ অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে গৃহীদের অষ্টশীল বা উপোসথশীল এবং অন্য যেকোনো সময় পঞ্চশীল পালনের বিধান প্রবর্তন করেন।

মহাবর্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পিলিন্দবৎস স্থবির এক সময় রাজগৃহে পাহাড় পরিষ্কার করছিলেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধশিষ্য পিলিন্দবৎস স্থবিরকে এরূপ কাজ করতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানলেন ভিক্ষুদের বাসের জন্য স্থান প্রস্তুত করছেন। রাজা বিম্বিসার বললেন তথাগত বুদ্ধ সম্মতি দিলে তিনি এর ব্যবস্থা করবেন। বুদ্ধের সম্মতি যথাসময়ে পাওয়া গেল। কিন্তু রাজা এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে হঠাৎ বিষয়টি তাঁর স্মরণ হলো। তখন প্রধান অমাত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিক্ষুদের জন্য আমি বাসস্থান তৈরি করে দেব বলেছিলাম, সে কাজ কি সম্পন্ন করা হয়েছিল?' উত্তরে অমাত্য বলল, না। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিশ্রুতির পর কত রাত অতিবাহিত হলো? অমাত্য গনণা করে বললেন পাঁচশ' রাত্রি। তখন রাজা ভিক্ষুদের জন্য পাঁচশ'টি আরাম নির্মাণ করে দিতে আদেশ দিলেন। কালক্রমে রাজগৃহের এ স্থানটি 'পিলিন্দবৎস গ্রাম' নামে খ্যাত হয়।

বিম্বিসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রথমে বুদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়ে তিনি বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। রাজা অজাতশত্রু তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ–মহাসঙ্গীতির সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক অনন্য ইতিহাস। এ সঙ্গীতিতে প্রাজ্ঞ ও ধর্মাভিজ্ঞ পাঁচশ' ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেন। সাত মাসব্যাপী এই সঙ্গীতি সভার কার্যক্রম স্থায়ী হয়েছিল।

পরবর্তিতে তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশ' বছর পরে মগধের রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ও প্রায় দুশ' আঠার বছর পরে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হয় তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি। বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ণ করার ক্ষেত্রে এ মহাসঙ্গীতিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বৌদ্ধ–মহাসঙ্গীতিতে সাতশ' নির্বাচিত ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই মহাসঙ্গীতি আটমাসব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। তৃতীয় বৌদ্ধ–মহাসঙ্গীতিতে এক হাজার নির্বাচিত ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেন। এ সঙ্গীতি সভার স্থায়ীকাল ছিল নয় মাস কাল। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে এই বৌদ্ধ–মহাসঙ্গীতিগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মহাসঙ্গীতির কখনোই সম্ভব নয়। রাজাদের এই অবদান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

এ ছাড়া অন্যান্য রাজাদের মধ্যে কোসলের রাজা প্রসেনজিৎ ও উজ্জয়িনির রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের গৃহী ভক্ত ছিলেন। তাঁরা রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা সে সময় নানাভাবে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন বিকাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে সহায়তা দিয়েছিলেন। ।

সারসংক্ষেপ :

খ্রিস্ট পূর্ব ৬২৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। এসময় ভারতবর্ষে ৬২টি প্রকার ধর্মীয় মতাদর্শের প্রচলন ছিল। এ মতবাদসমূহ ছিল খণ্ডিত। সাধনার পূর্ণতা অর্জন বা সর্ববিধ দুঃখ মুক্তির কোনো নির্দেশনা এতে ছিল না। এসময় গৌতমবুদ্ধ প্রচার করলেন সর্বজীবের স্বতন্ত্র মূল্যবোধের কথা। বুদ্ধ বললেন, নিজের কর্মের মাধ্যমেই নিজের ভবিষ্যত রচিত হয়। কারো আশির্বাদ বা যাগ যজ্ঞের প্রভাবে নয়। যে যেমন কর্ম করবে, সে তেমন ফল ভোগ করবে। বুদ্ধের এ বাণী মানবগোষ্ঠীর চিন্তায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো।
গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ১৬টি জনপদ বা রাজ্য ছিল। এগুলো 'মহাজনপদ' নামে খ্যাত ছিল। বুদ্ধের সমসাময়িককালে এ রাজ্যগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে বুদ্ধের বাণীর প্রসার ঘটেছিল। এ সময় ভারতবর্ষের অনেক খ্যাতিসম্পন্ন রাজা বুদ্ধের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মগধের রাজা বিম্বিসার, তাঁর পুত্র অজাতশত্রু, কোসলের রাজা প্রসেনজিৎ ও উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্ট পূর্ব কত অব্দে ?
ক. ৫৮০ অব্দে খ. ৫৮৫ অব্দে
গ. ৬২৩ অব্দে ঘ. ৬৩২ অব্দে

২। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে কত প্রকার সন্ন্যাস মতবাদ ছিল ?
ক. ৬২ প্রকার খ. ৬৫ প্রকার
গ. ৬৮ প্রকার ঘ. ৭৫ প্রকার

৩। গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ কয়টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল ?

ক. ১০টি রাজ্যে খ. ২০টি রাজ্যে
গ. ১৫টি রাজ্যে ঘ. ১৬টি রাজ্যে

৪। বিম্বিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?
ক. কোশল রাজ্যের খ. মগধ রাজ্যের
গ. মল্ল রাজ্যের ঘ. কাশী রাজ্যের

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. খ

পাঠ-১৪.৩ মৌর্য যুগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঐতিহাসিক মৌর্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌর্য, নন্দবংশ, চন্দ্রগুপ্ত, কৌটিল্যব্রাহ্মণ, বিন্দুসার, সম্রাট অশোক, সৌর্য-বীর্যের পরাক্রমতায়, ধর্মযাত্রা, ৮৪ হাজার স্তুপ, অশোক লিপি।

চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের পরিচয়

মৌর্য বংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য । তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্যরা ছিল সূর্যবংশীয়। সূর্যবংশীয় রাজকুমার মান্ধ্যাতৃ থেকে মৌর্যবংশের উদ্ভব। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌর্যরা এক গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ছিলেন। পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তারাও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মগধের রাজা ছিল নন্দবংশীয়। এ সময় চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশিলার এক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার নাম কোটিল্য ব্রাহ্মণ। যিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন। কোটিল্য ব্রাহ্মণ রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রি ছিলেন। তার সহায়তায় নন্দ বংশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত শুধু একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও বিজেতা ছিলেন না, তিনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তাঁর মন্ত্রি কোটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন।

বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের উত্তরসূরী। রাজ্য পরিচালনা ও বহির্দেশের সাথে সমন্বয় ও সম্পর্ক উন্নয়নে চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উভয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ছিলেন। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ভারত উপমহাদেশ থেকে গ্রীক শাসন উচ্ছেদের প্রথম উদ্যোগ নেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রীকদের পরাজিত করে বহু রাজ্য তিনি অধিকার করেন। এসময় সিরিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারের একসময়ের সেনাপতি সেলুকাসের সাথে তাঁর প্রথমে দ্বন্ধ ও পরে মৈত্রী সম্পর্ক হয়। মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য সেলুকাস মেঘাস্থিনিস নামক একজন দূত চন্দ্রগুপ্তের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে কান্দাহার, কাবুল, হিরাট ও বেলুচিস্থান হস্তান্তর করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে পাঁচশ হাতি উপহার দিয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন জৈন ধর্মের অনুসারি। তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। কথিত আছে, এক সময় রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রাজা চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রের হাতে সিংহাসনের ভার তুলে দিয়ে তিনি মহীশূরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিন্দুসার হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র। তিনি চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারি হিসেবে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। কোটিল্য বিন্দুসারের রাজত্বকালেও কিছুদিন মন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিন্দুসার রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নেননি। খ্যাতিমান সম্রাট অশোক ছিলেন রাজা বিন্দুসারের পুত্র।
বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলায় একবার প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। রাজা বিন্দুসার যুবরাজ অশোককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। অশোক শান্তিপূর্ণভাবেই সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অশোক ছাড়াও রাজা বিন্দুসারের আরও অনেক পুত্র ও কন্যা ছিল। বিন্দুসার পঁচিশ বছর রাজত্ব করেছেন বলে জানা যায়। অতপর বার্ধক্যজণিত কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র অশোক সিংহাসনের উত্তরাধিকারি হয়।

রাজ্য বিস্তার ও শৌর্য বীর্যের পরাক্রমতায় বিন্দুসার পুত্র অশোক 'সম্রাট অশোক' নামে সমধিক খ্যাত হন। সম্রাট অশোক প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেননি। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগে। কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়। এই ঘোরতর যুদ্ধের পর অশোকের মন স্পষ্টভাবে পরিবর্তন হয়। তারপর ন্যাগ্রোধ শ্রামণকে দেখে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ধর্মালোকে পরিণত হন। এছাড়া অন্য একটি অভিধা ছিল 'দেবানাম পিয় পিয়দসি' অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী। তিনি বুদ্ধের মূল শিক্ষাসমূহ ভালভাবে অধ্যয়ন করেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে মৌর্যবংশের অবদান

মৌর্যবংশের কীর্তিমান নৃপতি অশোক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়ে তিনি সর্বসাধারণের কল্যাণমুখি কাজে গভীর মনোনিবেশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্য রাজ্যের সবখানে বুদ্ধের অনুশাসন লিখে দিলেন। সেগুলো খোদাই করা হয় পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের স্তম্ভে, ও গুহা গাত্রে। এভাবে তিনি অনেক অনুশাসন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সবখানে ছড়িয়ে দেন।

তার মধ্যে ৩৪টি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। এসব অনুশাসনের মধ্যে আছে গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, ভিক্ষু শ্রামণ ও দরিদ্রদের দান ইত্যাদি। আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সৎ ব্যবহার করার কথাও উল্লেখ আছে। এছাড়া জীবনে পবিত্রতা, সত্যবাদিতা ও দানশীলতার কথা বর্ণিত রয়েছে। তিনি সকল ধর্মের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। তাঁর সামাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে বাস করতেন। সকলকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলো চিহ্নিত করেন ও সেসব স্থানে বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

সেবা ও কল্যাণের ব্রত নিয়ে তিনি রাজ্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন। এটিকে 'ধর্মযাত্রা বলা' হতো। ধর্মযাত্রার সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধের পবিত্র অস্থিধাতু সংগ্রহ করেন। তারপর ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করে সেগুলো সমগ্র ভারতবর্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশের মানুষকে গৌতম বুদ্ধের কল্যাণকর বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করা। তাঁর রাজত্বের সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রে। এই সংগীতিতে তাঁর চেষ্টায় ধার্মিক ও অধার্মিক ভিক্ষুদের মধ্যে মতের পার্থক্যের অবসান হয়। অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। সিংহলের রাজা তিস্স অশোকের সম্মানে নিজেও 'দেবনাম পিয়' উপাধি গ্রহণ করেন।

অশোকের অনুশাসনে লেখা আছে যে, তিনি আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাণী গ্রিক ভাষায় তর্জমা করে প্রচার করা হয়েছিল। অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানে অশোকের শিলালিপি পাওয়া যায়। এ সময় ভারত ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিব্বতে ধর্মদূত প্রেরণ করা হয়।

মৌর্যরা প্রায় ১৩৭ বছর মগধের সিংহাসনে ছিলেন। তারপর মৌয্য বংশের বিলুপ্তি হয়। এরপর শুঙ্গ বংশ সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অস্থিত্ব বজায় ছিল। হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশে অশোকের নির্মিত স্তুপ দেখেছেন বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন।

সারসংক্ষেপ :

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে মৌর্য যুগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌর্যরা ছিলেন এক গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী। নন্দ বংশের রাজাকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত শুধু একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও বিজেতা ছিলেন না, তিনি সুদক্ষ

শাসকও ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসারও একজন খ্যাতিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। সম্রাট অশোক ছিলেন রাজা বিন্দুসারের পুত্র।

মৌর্যরা সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে বাস করতেন। সকলকে তাঁরা মুক্ত হস্তে দান করতেন। সেবা ও কল্যাণের ব্রত নিয়ে তাঁরা রাজ্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন। মৌর্যরা প্রায় ১৩৭ বছর মগধের সিংহাসনে ছিলেন। মৌর্যদের সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বহুমাত্রিক উন্নয়ন ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

ক. রাজা বিন্দুসার খ. রাজা বিম্বিসার

গ. রাজা চন্দ্রগুপ্ত ঘ. রাজা অশোক

২। কে চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন?

ক. ব্রাহ্মণ পিঙ্গল ভারদ্বাজ খ. ব্রাহ্মণকোটিল্য

গ. ব্রাহ্মণ পুক্কুরসাতি ঘ. ব্রাহ্মণ ভাস্বর

৩। সম্রাট অশোক কয়টি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে ?

ক. ২৪টি খ. ৪৪টি

গ. ৫৪টি ঘ. ৩৪টি

৪। বাংলাদেশে অশোকের নির্মিত স্তুপ দেখেছেন বলে কে উল্লেখ করেছেন?

ক. হিউয়েন সাঙ খ. ফা ইয়েন

গ. ইৎ সিং ঘ. কোটিল্য

উত্তরমালা : ১. গ, ২. খ, ৩. ক

পাঠ-১৪.৪ কুষাণ যুগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কুষাণ বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে কনিষ্কের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কুষাণবংশ, সম্রাট কণিষ্ক, কুণ্ডলবন বিহার, বিভাসাশাস্ত্র, সর্বাস্তীবাদী, সঙ্গীতিকারক, টীকাগ্রন্থ।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। কুষাণ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন কুজুল কদ্‌ফিসেস। মগধ বা বর্তমান বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল ও আফগানিস্তান নিয়ে এই সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন কণিষ্ক। সম্রাট অশোকের মত তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। স্থবির পার্শ্বকের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগী হন। তারপর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে কণিষ্কের অবদান

সম্রাট কণিষ্কের সময়ে ভিক্ষুদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের প্রচার শুরু হয়। ভিক্ষুদের মধ্যে সংহতি আনার জন্য কণিষ্ক চেষ্টা শুরু করেন। স্থবির পার্শ্বকের পরামর্শে সম্রাট কণিষ্ক একটি সঙ্গীতির আয়োজন করেছিলেন। বিভিন্ন মতবাদের পণ্ডিত ভিক্ষুদের আহবান করে জালন্ধরে সমবেত করেন। উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে ৫০০জন ভিক্ষু সঙ্গীতিকারক নির্বাচিত হন। সম্রাট তাঁদের জন্য একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেন। এ ভবনেই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে এর নাম হয় কুণ্ডলবন বিহার। বৌদ্ধধর্মে এটিকে চতুর্থ সঙ্গীতি বলা হয়। এ সংগীতিতে পালির বদলে প্রথম সংস্কৃতে শ্লোকগুলো সংগৃহীত হয়। তারপর সংকলিত ত্রিপিটকের ওপর টীকাগ্রন্থ রচিত হয়। এর নাম বিভাসাশাস্ত্র। এ সংগীতিকে কণিষ্ক সংগীতি বা সর্বাস্তিবাদী সংগীতিও বলা হয়।

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রসারে অনেক স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। চীন ও মধ্য এশিয়ার তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কণিষ্কের সময় অশ্বঘোষ ও বসুমিত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কণিষ্ক নিজেও অত্যন্ত গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে শিলালিপিতে উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। আফগানিস্তানে এ রকম একটি লিপি পাওয়া যায়। শিলালিপিতে বিহার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কণিষ্কের পর গুপ্ত সম্রাজ্যের সময় ফা হিয়েন ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের কথা বলে গেছেন। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানে বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি পাওয়া যায়। রাজশাহীর বিহারেও এই সময়ে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে কণিষ্কের সময় বাংলাদেশেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করেছিল।

সারসংক্ষেপ :

কুষাণ বংশের প্রথম রাজা কুজুল কদ্‌ফিসেস। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে তাঁর রাজত্বের সূচনা হয়। বর্তমান ভারতের বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল ও আফগানিস্তান নিয়ে কুষাণ সাম্রাজ্যর অবস্থান ছিল। সম্রাট কণিষ্ক ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। ভিক্ষু পার্শ্বকের পরামর্শে সম্রাট কণিষ্ক একটি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটিকে চতুর্থ সঙ্গীতি বলা হয়।

সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে অনেক স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। চীন ও মধ্য এশিয়ার তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। কণিষ্কের সময় মহাকবি অশ্বঘোষ ও দার্শনিক বসুমিত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। সম্রাট কণিষ্ক একজন শাসক ছাড়াও অন্য বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন শতাব্দীতে কুষাণ রাজত্বের সূচনা হয়?
- ক. খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে
- খ. খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে
- গ. খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে
- ঘ. খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে

২। কুষাণ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন ?
- ক. সম্রাট অশোক
- খ. সম্রাট কণিষ্ক
- গ. রাজা কজুল কদফিসেস
- ঘ. রাজা বিম্বিসার

৩। সম্রাট কণিষ্ক আয়োজিত বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে কতজন ভিক্ষু সঙ্গীতিকারক নির্বাচিত হন ?
- ক. ৫০০জন ভিক্ষু
- খ. ৭০০জন ভিক্ষু
- গ. ৭৫০জন ভিক্ষু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ
- ঘ. ৫৫০জন ভিক্ষু

৪। বাংলাদেশের কোন জেলায় বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি পাওয়া যায় ?
- ক. চট্টগ্রাম জেলায়
- খ. কুমিল্লা জেলায়
- গ. রাজশাহী জেলায়
- ঘ. বগুড়া জেলায়

উত্তরমালা : ১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ঘ

পাঠ-১৪.৫ পাল যুগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে পাল রাজাদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মাৎস্যন্যায়, পণ্ডিত বিহার, জগদ্দল বিহার, চর্যাপদ বা দোহা, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম।

অষ্টম শতকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দেয়। দেশে তখন কোন রাজা ছিল না। পরিস্থিতি ছিল সমাজের ক্ষমতাধরদের নিয়ন্ত্রণে। এরূপ বিশৃংখল অবস্থাকে বলা হতো 'মাৎস্যন্যায়'। মাৎস্যন্যায় বলতে ন্যায়–নীতি হীন ব্যবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বড় মাছ যেমন নির্বিচারে ছোট মাছদের খেয়ে পেলে তেমনি রাজ্যে ও সমাজেও যদি নির্বিচার জুলুমের প্রচলন হয় তখন তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। এরূপ অবস্থায় বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজা হন।

রাজা গোপালের পিতার নাম ছিল বপ্পট দেব। তিনি ছিলেন গৌড়ের দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র। গোপাল প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ পদে অভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। রাজা ধর্মপালের সময় বিক্রমশীল ও সোমপুর মহাবিহারসহ বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উত্তরাধিকারি হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। এভাবে পালবংশ প্রায় ৪০০ বছর ব্যাপী রাজত্ব করেন। এ সময় প্রজন্ম পরম্পরায় পালবংশের আঠারজন রাজা রাজত্ব করেন। পরবর্তি প্রজন্মের রাজাদের মধ্যে মহীপাল, রামপাল, ন্যায়পাল ও মদনপালের নাম বিশেষভাবে সুপরিচিত। পালবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন গোবিন্দপাল।

পালবংশের সব রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিও তাঁরা মর্যাদাশীল ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময় বাংলার সঙ্গে এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বালীদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপময় রাজ্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেখানে আগেই বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। পাল যুগে সেই অঞ্চলের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে পাল রাজাদের অবদান

পাল যুগের প্রথম দিকে মগধের ওদন্তপুরী, সোমপুরী ও বিক্রমশীল বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। এসময়ের অন্যান্য বিখ্যাত বিহারের মধ্যে পণ্ডিত বিহার ও জগদ্দল বিহারের নাম পাওয়া যায়। রাজা মহীপাল সারনাথ ও বুদ্ধগয়া অঞ্চলে অনেক বিহার সংস্কার করেন এবং নতুন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিবিধ বিষয়ে প্রায় দুশ'টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আমন্ত্রিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম দর্শন প্রচারের জন্য তিব্বতে যান। তিনি তিব্বতবাসীকে বুদ্ধবাণীর আদর্শ পথে পরিচালিত করতে সমর্থ হন। ধর্মপালের সময় নালন্দা মহাবিহার নতুন করে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ ছাড়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারসমূহের গৌরবও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ সমস্ত বিহারে তিব্বত ও চীন থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামণ শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। এগুলোতে অসংখ্য খ্যাতিমান বৌদ্ধ

পণ্ডিত ভিক্ষু জ্ঞান সাধনা করেছেন। তিব্বতি ও ভারতীয় পণ্ডিতরা এখানকার বহু গ্রন্থ অনুবাদ করে তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল ও চীন প্রভৃতি দেশে নিয়ে যান।

পাল যুগে বাংলা ভাষার উন্মেষ হয়। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বা বৌদ্ধ গান ও দোহা এসময় রচিত। এগুলো রচনাকাল ৮ম থেকে ১১শ শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। এ যুগে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এ সময় বাংলাদেশে শাক্ত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও প্রসার ঘটে। পাল রাজারা এতে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পালযুগে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম ও সাস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মিলিতভাবে বিকাশ লাভ করে।

সারসংক্ষেপ :

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোপাল বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাজা। গোপাল প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ধর্মপাল তাঁর উত্তরসূরী হয়ে রাজপদে অভিষিক্ত হন। পালবংশের প্রায় সব রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ। ধর্মপালের সময় বহু উচ্চমানের বৌদ্ধ ধর্মীয় ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। বিক্রমশীল ও সোমপুর মহাবিহার এসময় গড়ে ওঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উত্তরাধিকারি হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। এভাবে পালবংশ প্রায় ৪০০ বছর ব্যাপী রাজত্ব করেন। পালবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন গোবিন্দপাল। পালবংশের সময় বাংলার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও অত্যন্ত মর্যাদার সাথে বসবাস করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অসম্প্রদায়িক মূল্যবোধ পাল আমলে সমাজে ও রাষ্ট্রে অটুট ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায় ?

ক. ন্যায়–সম্পন্ন ব্যবস্থাকে বোঝায় খ. ন্যায়–দুর্নীতি হীন ব্যবস্থাকে বোঝায়

গ. প্রজ্ঞা– হীন ব্যবস্থাকে বোঝায় ঘ. ন্যায়–নীতি হীন ব্যবস্থাকে বোঝায়

২। বাংলার প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাজার নাম কী?

ক. রাজা ধর্মপাল খ. রাজা দেবপাল

গ. রাজা গোপাল ঘ. রাজা গোবিন্দপাল

৩। বিক্রমশীল ও সোমপুর মহাবিহার কোন রাজার সময় গড়ে ওঠেছিল?

ক. রাজা গোপলের সময় খ. রাজা দেবপালের সময়

গ. রাজা ধর্মপালের সময় ঘ. রাজা মহীপালের সময়

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ, ৩. গ

পাঠ-১৪.৬ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রাক আধুনিক যুগ, চাকমা, বড়ুয়া, মারমা, রাখাইন, সমতট, সিংহ উপাধিধারী, আরাকান, চম্পকনগর, রাজানগর, চাকমা কূল।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয় বহু প্রাচীনকালে। নানা যুগে নানা ভাবে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি এখানে প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন যুগের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রাক আধুনিক যুগ

সম্রাট অশোকের সময় সোণ থের ও উত্তর থেরোর মাধ্যমেই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। কিন্তু সে সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনুরূপ প্রাক আধুনিক যুগ ১৭০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া খুব কঠিন। জানা যায় সেসময় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালীতে বৌদ্ধরা বাস করতো। এছাড়া রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলেও কিছু বৌদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধদের মধ্যে বিবিধ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় আছে। এগুলো ছোট–বড় বা উচুঁ–নিচুর কোনো ভেদ নয়। এই ভেদ বংশের ঐতিহ্য ও অবস্থানগত পরিচয় প্রকাশক। এখানে সকলেই সমান। এই পরিচয় প্রকাশক অভিধা বা পদবীসমূহ মূলত অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাস ছিল চাকমা, বড়ুয়া, মারমা ও রাখাইন বৌদ্ধদের। এগুলোর মধ্যে চাকমা, মারমা ও রাখাইন বৌদ্ধদের পৈত্রিক বসবাস চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে। এছাড়া চাক, খিয়াং, তঞ্চঙ্গার বসবাসও এ অঞ্চলে। ইতিহাস পাঠে ধারণা করা হয় 'বড়ুয়া' অভিধাযুক্ত বৌদ্ধরা মগধ থেকে আসাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। ১২০১ সালে বখতিয়ার খিলজী মগধ (বর্তমান বিহার রাজ্য) আক্রমণ করেন। সে সময় মগধ ও বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। বখতিয়ার খিলজীর হাতে লক্ষণ সেন পরাজিত হন এ সময় বৌদ্ধদের একটি দল পূর্ব দিকে চলে আসে। অনুমান করা হয় তারাই কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের পূর্বপুরুষ। তাছাড়া সে সময় কুমিল্লা অঞ্চল ছিল পট্টিকের রাজাদের শাসনে। পট্টিকের রাজা রণবঙ্কেমল্ল ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি ১২০৪ থেকে ১২২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি তখন সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এই অঞ্চলের নাম ছিল সমতট। তখন ময়নামতিতে শালবন বিহার, পট্টিকের বিহার ইত্যাদির গৌরব ছিল অক্ষুণ্ন।

বর্তমানে কুমিল্লার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধিধারী। 'সিংহ' অর্থ শ্রেষ্ঠ। শাক্যদের নামের সঙ্গে শব্দটি যুক্ত। গৌতমের আরেক নাম ছিল শাক্যসিংহ। কুমিল্লার বৌদ্ধরা মনে করেন তাঁরা শাক্যসিংহের বংশধর।

আঠারশ' শতকে আরাকানি বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম শাসন করত। এ সময় চাকমা রাজা শেরমুস্ত খান ছিলেন চট্টগ্রামের শাসক। তিনি আরাকান রাজার অধীনস্থ রাজা ছিলেন। চাকমারা নিজেদের আদি নিবাস চম্পক নগর মনে করেন। সেখান থেকে তাঁরা চট্টগ্রামে আসেন বলে মনে করেন। এই চম্পক নগর ছিল প্রাচীন ভারতে । আবার অনেকের মতে কুমিল্লার কাছাকাছি কোথাও এ নামে একটি নগর ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন মায়ানমার পূর্বে কোন অঞ্চলে এটি ছিল। শেরমুস্ত খান

১৭৩৭ সাল থেকে ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা পলাশীতে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত চামকা রাজার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলে। তখন চাকমা রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে শঙ্খ নদী ও পশ্চিমে ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এ সময় চট্টগ্রামের চাক্মা, চাক, খিয়াং, তঞ্চঙ্গা ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা বাস করতে। তাঁরা সবাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা চট্টগ্রামে বাস করতো। তখন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেল বা অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি ছিল।

মারমারা রামু ও মাতামুহুরী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে ১৭৭৪ সালের দিকে। তারপর ৩০ বছর পর তারা বান্দরবান শহরে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৪ সালের দিকে আরাকান থেকে রাখাইন বৌদ্ধরা বরিশালের পটুয়াখালী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। চট্টগ্রাম অঞ্চল বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল বলে কিছু মারমা বা মগ ঢাকায় চলে আসে। ঢাকার বড় মগবাজার ও মগবাজার তার সাক্ষ্য বহন করছে। ঢাকার ধামরাই অঞ্চলের নাম ধর্মরাজিক থেকে উদ্ভুত। সাভারের প্রাচীন নাম ছিল সাহোর। সাহোরে বর্তমানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। অতীশ দীপঙ্কর এই সাহোরে পড়াশুনা করেছিলেন।

আঠারশ' শতকে বড়ুয়ারা রাঙ্গুনীয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, সীতাকুণ্ড, বোয়ালখালী, পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী প্রভৃতি সব অঞ্চলে বাস করত। কক্সবাজার ও টেকনাফ অঞ্চলে বড়ুয়া, মারমা ও রাখাইনদের প্রাধান্য ছিল। 'বড়ুয়া' শব্দের অর্থ বড় আরিয়া বা বড় আর্য। 'বড়ুয়া'া বৌদ্ধদের মধ্যে তালুকদার, মুৎসুদ্দী, চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিও আছে।

চট্টগ্রামে চাকমা রাজ্যের রাজধানী প্রথমে সাতকানিয়া বা রামুর কাছাকাছি কোথাও ছিল। 'সাতকানিয়া' শব্দ এসেছে সাক কন্যা বা চাকমা রাজকন্যার থেকে। রামু থানাতে এখনও চাকমা কূল নামে একটি স্থান আছে।

১৭৮৫ সালে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগর গ্রামে স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে রাজানগর থেকে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে চলে যায়। কারণ এ সময় চন্দ্রঘোনা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর অফিস রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হয়।

বৌদ্ধদের ধর্মগুরুর নাম ভিক্ষু। ভিক্ষুদের মাধ্যমে বৌদ্ধদের যাবতীয় ধর্মীয় কাজ চলে। ভিক্ষুমণ্ডলীকে বলে ভিক্ষুসঙ্ঘ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব ছিল। মহাযান ধর্ম মতের প্রভাবে সমগ্র উত্তর ভারত তখন এই তন্ত্রমন্ত্রের আওতায় পড়ে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনা চর্যাপদ এর গানগুলোতে এর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধদের মধ্যেও তখন এ প্রভাব ছিল। যেসব বৌদ্ধ মগধ থেকে এসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস শুরু করে তাদের সঙ্গে ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল না। এমন কী তালপাতা বা ভূর্জপত্রে লেখা ত্রিপিটক ও তারা সঙ্গে আনতে পারে নি। বৌদ্ধধর্মের তখন চরম দুর্দিন। এদিকে চাকমারাও রাজ্য হারিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের রংপুর, রাজশাহী, বগুড়ার রাজবংশীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ তখনও ছিল। এছাড়া আরও কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সেখানে আস্তে আস্তে নিজেদের আরও গুটিয়ে নিচ্ছিল। মহাস্থানগড় অঞ্চলের আশেপাশে নিভু নিভু করে জ্বলছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিখা। এখনও উত্তরবঙ্গে অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ আছে। বর্তমান এ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি অধিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পটুয়াখালী ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বৌদ্ধদের অবনতির কাল বলে মনে করা হয়।

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মের মতো যথাযথ মর্যাদায় অনুশীলিত হচ্ছে। এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অপরাপর ধর্ম অনুসারিদের মতো স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। সকলের সাথে সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে ধর্মাচরণ অনুসরণ করা এ দেশের বৌদ্ধদের অন্যতম ঐতিহ্য।

বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে চাকমা, মারমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের মিলিত ইতিহাস জানা দরকার। পার্বত্য তিনটি জেলা-রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গারা বাস করে। বড়ুয়া চৌধুরী ও সিংহরা বাস করে যথাক্রমে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায়। এদের ইতিহাসই বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাস।

চাকমা রাজা জানবক্স খান ১৮০০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সারা জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটান। জানবক্স খানের মৃত্যুর পর ধরম বক্স খান রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাণী কালিন্দী রাজত্ব শুরু করেন। দীর্ঘদিন ইংরেজরা তাঁকে রাণী স্বীকার করেন নি। ১৮৪৪ সালে ইংরেজরা তাঁকে সরকারিভারে পার্বত্য সার্কেলের প্রধান হিসেবে রাণী বলে স্বীকার করেন। তিনি ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব দিকের পুরো পার্বত্য এলাকাকে নিয়ে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধরাও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হয়। এ সময় বৌদ্ধদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার জোয়ার আসে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁরা কলকাতায়ও যেতে থাকেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেকে বার্মা (মায়ানমা) ও সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) গমন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির উদ্দেশ্যে এসময় বৌদ্ধরা আরাকান, মায়ানমা , কলকাতা, ত্রিপুরা ও আসাম পাড়ি দিতে থাকেন। এভাবে তদানীন্তন বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শিক্ষা অর্জন ও জীবিকার জন্য অনেক দেশে যেতেন। এ প্রভাব এখনো বিদ্যমান। বৌদ্ধদের নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই। সরকারি চাকরিসহ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি পেশাজীবী ও ব্যবসার সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত।

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধ ধর্মের কল্যাণে 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করেছে। এছাড়া ঢাকায় অবস্থিত 'বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড' থেকে পালি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর অধীনে দেশে প্রায় ১১৫টির মত পালি টোল ও কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পালি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এখানে উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৮৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া আরও কিছু বৌদ্ধ সংগঠন আছে। সেগুলোর মধ্যে পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ, বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুমহাসভা, রাখাইন মারমা সঙ্ঘ কাউন্সিল, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ মারমা বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পন্ন বৌদ্ধ বিহারগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিখ্যাত প্রাচীন বিহার রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পটিয়ার ঠেগরপুনি বুড়া গোঁসাই বিহার, কাপ্তাই চিৎমরম বিহার, ঊনাইনপুরা লংকারাম বিহার, সাতবাড়িয়া শান্তি বিহার, আবুরখীল কেন্দ্রীয় বিহার, পাহাড়তলীর মহামুনি বিহার, কক্সবাজার অগ্গমেধা বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবান বিহার, রামুর রামকোট বিহার, রাউজান সুদর্শন বিহার, মানিকছড়ি রাজার বিহার, রাজানগর রাজবিহার, সৈদয়বাড়ি ধর্মচক্র বিহার, চেঁদিরপুনি বিহার, ইছামতি ধাতুচৈত্য বিহার, ঢেমশা শাক্যমুনি বিহার, রাউজান আর্যমিত্র বিহার উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে মেলা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অনেক বৌদ্ধ বিহারে প্রতিবছর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নাটক, গান ও বুদ্ধ কীর্তনের আয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে চক্রশালা মেলা, রাঙ্গামাটি

রাজবিহার মেলা, মানিকপুর পরিনির্বাণ মেলা, মছদিয়া চৈত্য মেলা, ঠেগরপুনি বুড়াগোঁসাই মেলা, বিনাজুরি পরিনির্বাণ মেলা, ইছামতি ধাতুচৈত্য মেলা, লাঠিছড়ি বুদ্ধ মেলা, শীল ঘাটা মহাপরিনির্বাণ মেলা, ঢেমশা শাক্যমুনি মেলা, আবুরখীল কেন্দ্রীয় যোগেন্দ্র বৌদ্ধ বিহার মেলা, পাঁচরিয়া বাইশ বুদ্ধের মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আশি দশকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের ও শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ ভিক্ষুর প্রচেষ্টায়।

রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। এ সময় বিচ্ছিন্নভাবে ঢাকার স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো। পরবর্তিতে ১৯৬০ সালে ঢাকার প্রসিদ্ধ বিহার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি রাজধানী ঢাকার প্রথম বৌদ্ধ বিহার। এর মাধ্যমে বৌদ্ধদের ঢাকায় স্থায়ী ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার আবহ সৃষ্টি হয়। এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের। আশির দশকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের ও শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ ভিক্ষুর প্রচেষ্টায়।

বাংলাদেশের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ছাড়াও ঢাকার সাভারে, নরসিংদির ওয়ারী বটেশ্বরে.এবং দিনাজপুর অঞ্চলে ও রাজধানী ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে অনেকগুলো প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। সেগুলো সকল ধর্মের লোকের কাছে গর্বের বস্তু। এগুলো দেশের সম্পদ। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু পাহাড়ে, মহেশখালীর আদিনাথ পাহাড়ে, রামুর রামকূটে, রাঙ্গুনীয়া কলেজের দক্ষিণে এবং চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ে প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তি ছড়িয়ে আছে। সেখানে খনন কাজ চালালে অনেক মূল্যবান প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া যাবে।

প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হলে অনেক পড়াশুনা করা দরকার। এর মধ্যে যেসব স্থানের কথা বলা হয়েছে সেসব স্থান দেখলে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি দেশের মানুষকে জানার সুযোগ হবে। তীর্থস্থানগুলো বিদেশে হলে সেই দেশের মানুষকে জানার সুযোগ হয়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে জানা দরকার, এতে জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

এক সময় বৌদ্ধধর্ম এ উপমহাদেশ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার গৌরব দীপ্ত ইতিহাস ছড়িয়ে আছে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সেসব সন্ধান এখন পাওয়া যাচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে বিশ লক্ষের মত। বাংলাদেশ সরকার রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের উচিত ঐতিহাসিক এ তীর্থস্থানসমূহ ভ্রমণ করে এগুলোর ইতিহাস জানা এবং এগুলোর গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

সারসংক্ষেপ :

সম্রাট অশোকের সময় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। এর উদ্‌গাতা ছিলেন সোণ থের ও উত্তর থের। এই ধারাবাহিকতায় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার লাভ করে। সময়ের গতি পরিক্রমায় এবং রাজনৈতিক সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের গতি প্রবাহেও নানা উত্থান পতন হয়েছে। আঠারশ' শতকে আরাকানি বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম শাসন করতেন। এসময় চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন জেলাসমূহে বৌদ্ধধর্ম বিকাশের ধারা উজ্জ্বল হয়। এভাবে আধুনিক কালে বা বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজমান প্রধান চার ধর্মের লোকেরা বসবাস করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এ দেশের অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বৌদ্ধরা দেশপ্রেমিক, দেশের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে এ দেশের বৌদ্ধরা নিবেদিত। মর্যাদার সাথে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা অটুট রেখেছে। এছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির লোকেরাও এখানে আছে। তাঁরা নানা ধর্ম বর্ণের। তাঁদের আছে নানা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস। অতএব বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ সেখানে সব ধর্মের মানুষ ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও সম্প্রীতিতে বসবাস করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কাদের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম বৌদ্ধধর্মের সূচনা হয় ?

ক. সোণ থের ও বসুমিত্র থের'র মাধ্যমে খ. মহাকাশ্যপ থের ও উত্তর থের'র মাধ্যমে

গ. সোণ থের ও উত্তর থের'র মাধ্যমে ঘ. ধর্মরক্ষিত থের ও উত্তর থের'র মাধ্যমে পঞ্চ-পর্যায়ে

২। বাংলাদেশ সরকার কত সালে 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেন?

ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮২ সালে

গ. ১৯৮৩ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

৩। রাজধানী ঢাকার প্রথম বৌদ্ধ বিহার কত সালে হয়?

ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৭০ সালে

গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৪০ সালে

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সম্রাট অশোক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুচিতা বড়ুয়ার শিক্ষক বলেন যে, সম্রাট অশোক এক সম্মিলিত জম্বুদ্বীপ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রজাদের ধর্ম শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

ক. সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য কী নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন?

খ. মগধ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় ছিল লেখ।

গ. সম্রাট অশোকের মতো সাধারণ মানুষের নৈতিক শিক্ষার জন্যে আপনি কী কী সুপারিশ করেন?

ঘ. বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্রাট অশোকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

শিক্ষা মুৎসুদ্দি বৌদ্ধ ইতিহাসের একজন আগ্রহী শিক্ষার্থী। সে কুষাণযুগোর বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট কণিষ্কের ইতিহাস মন দিয়ে পড়েছে। সম্রাট কণিষ্ক জলন্ধর বিহারে বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন। এ সংগীতিকে সর্বাস্তিবাদী সংগীতিও বলা হয়। এ সংগীতির মাধ্যমে মহাযান ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। এ সময় বৌদ্ধ শিল্প ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে এবং ভারতীয় শিল্প ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ক. সম্রাট কণিষ্কের পূর্ব পুরুষগণ কোন জাতি ছিলেন?

খ. সম্রাট কণিষ্কের সময়ে অনুষ্ঠিত সংগীতিকে কেন সর্বাস্তিবাদী সংগীতি বলা হয়?

গ. আপনার দৃষ্টিতে সম্রাট কণিষ্কের শাসনামলে বৌদ্ধ তথা ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের যে উন্নতি সাধিত হয় তা বর্ণনা করুন।

ঘ. মহাযান ধর্মগ্রন্থ রচনার পটভূমিতে চতুর্থ সংগীতির গুরুত্ব অত্যাধিক - আপনি কী এ মতের সাথে একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।